ইউনিট
৯

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ
(Geographical Description of Bangladesh)

ভূমিকা

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী এবং দক্ষিণের বিস্তৃত বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সম্পদের ভান্ডার এদেশকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া এদেশের জলবায়ু বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানকার জলবায়ুতে ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের ভিন্নতা ঋতুবৈচিত্র্যতা দান করেছে। এই ইউনিটে আমরা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু প্রভৃতি আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৯.১ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি
পাঠ ৯.২ : বাংলাদেশের নদ-নদী
পাঠ ৯.৩ : বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৯.৪ : বাংলাদেশের ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত
পাঠ ৯.৫ : মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং কালবৈশাখী ঝড়

পাঠ-৯.১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি (Geographical Location and Physiography of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের অবস্থান জানতে পারবেন;
- টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহের অবস্থান বলতে পারবেন এবং
- সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, টারশিয়ারি যুগের পাহাড়, প্লাইস্টোসিন-কালের সোপান, সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত। এদেশ প্রায় ২০°৩৪' উত্তর থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১' পূর্ব থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। ফলে এদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্থলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিয়ানমার অবস্থিত। আর দক্ষিণে রয়েছে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। ভূ-রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ভূ-খন্ডগত বিস্তৃতি বা আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাংলাদেশের বিস্তৃতি প্রায় ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কিলোমিটার। এদেশের মোট সীমারেখা ৪,৭১২ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৩,৭১৫ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সাথে ২৮১ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণে রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২.২২ কিলোমিটার এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪০ কিলোমিটার (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার)।

ভূ-প্রকৃতি (Physiography)

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এদেশের ভূ-খন্ড উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে বিস্তৃত। উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়ি অংশ ব্যতীত সমগ্র দেশ নদীবিধৌত পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি। এই পললের পুরুত্ব প্রায় ১৮-২২ কিলোমিটার।

ভূ-প্রকৃতির ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র- ৯.১.১)। যথা-

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং
৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় যে সকল পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড় নামে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বের সময়কে টারশিয়ারি যুগ বলা

হয়। রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়গুলো টারশিয়ারি যুগের। এ পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধারণা করা হয়। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক. দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং

খ. উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ

ক. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। তবে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পাহাড়গুলোর উচ্চতা ক্রমশ বেশি। সাম্প্রতিককালে আবিস্কৃত তাজিন ডং (বিজয়) পর্বতশৃঙ্গটি দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ যার উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এটি আবিস্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ছিল কিওক্রাডং। এর উচ্চতা ১,২৩০ মিটার। এ অঞ্চলের পাহাড়সমূহ কৃষিকাজের জন্য উপযোগী নয়। তবে স্থানীয় অধিবাসীগণ সীমিত পরিসরে জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকেন।

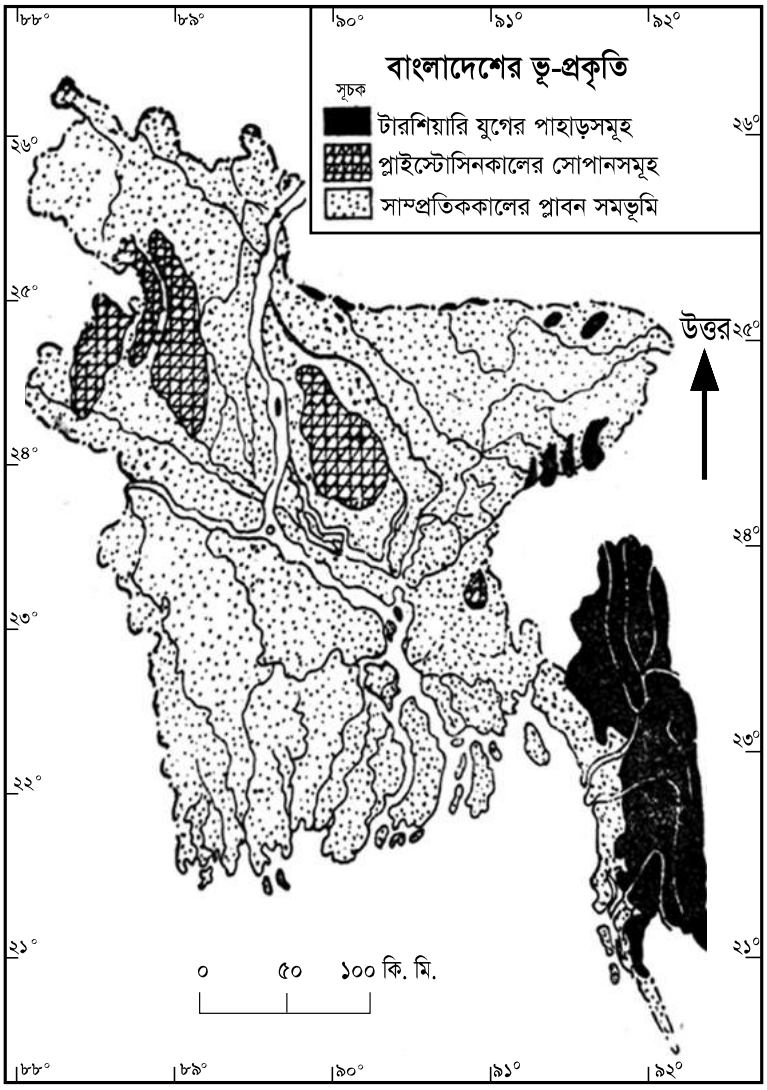

চিত্র ৯.১.১ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

খ. উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার। এ পার্বত্য অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ায় পাহাড়ের ঢালে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়।

২। **প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ :** আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল ও ধূসর। দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উচ্চভূমি এর অন্তর্ভুক্ত। প্লাইস্টোসিনকালে এসব উচ্চভূমি গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নিম্নে এসব উচ্চভূমি বর্ণনা করা হলো।

ক) বরেন্দ্রভূমি : বরেন্দ্রভূমি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট এবং রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এটি প্লাইস্টোসিন যুগের সর্ববৃহৎ উঁচুভূমি। বর্তমানে বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্প এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ অঞ্চলটিকে কৃষিকাজের জন্য বিশেষ উপযোগী করা হয়েছে।

খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় : টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় নিয়ে এলাকাটি গঠিত। এটি প্লাইস্টোসিন যুগের দ্বিতীয় বৃহত্তম উঁচুভূমি। সমভূমি থেকে এর গড় উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার এবং আয়তন ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। এখানকার মৃত্তিকা কৃষিকাজের জন্য তেমন উপযোগী নয়। এটি দেশের গজারী বৃক্ষের কেন্দ্র হিসাব পরিচিত।

গ) লালমাই পাহাড় : কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এ পাহাড়ের মাটি লাল এবং নুড়ি, বালি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

৩। **সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি :** টারশিয়ারি যুগের পাহাড় এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র দেশ সাম্প্রতিককালের পলি দ্বারা গঠিত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। এই প্লাবন সমভূমির বয়স ১২,০০০ বছরের কম। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি প্রধান নদীসহ অসংখ্য উপনদী এবং শাখানদী জালের ন্যায় সমগ্র দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। নদীগুলো সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় প্রতি বছর বন্যার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বন্যার সঙ্গে বাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই প্লাবন সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। বিস্তীর্ণ এ অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর এবং আবাদী।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি দেশের উত্তরাংশ থেকে ক্রমেই ঢালু হয়ে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার, নারায়ণগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার এবং সুন্দরবন প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত।

এ অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য জলাভূমি ও নিম্নভূমি। স্থানীয়ভাবে এগুলোকে বিল, ঝিল ও হাওড় বলে। রাজশাহী অঞ্চলের চলনবিল, ঢাকার আড়িয়াল বিল, গোপালগঞ্জের বিল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলার হাওড় ও বিল উল্লেখযোগ্য। মেঘনা নদীর মোহনায় হাতিয়া, সন্দ্বীপ, শাহবাজপুর এবং ভোলা জেলায় বেশ কিছু দ্বীপ অবস্থিত। এছাড়া দক্ষিণ উপকূলে আরও কিছু ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

ক) রংপুর ও দিনাজপুরের পাদদেশীয় সমভূমি।

খ) ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চলের বন্যাপ্রবণ প্লাবন সমভূমি।
গ) ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে ব-দ্বীপ সমভূমি।
ঘ) নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি।
ঙ) খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের মানচিত্রে বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতির অবস্থান নির্ণয় করুন। এছাড়া নিম্নোক্ত তথ্যগুলো লিখুন।

বাংলাদেশের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত অবস্থান কত ?	বাংলাদেশের আয়তন লিখুন।	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত ?	বরেন্দ্রভূমির আয়তন লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তিনদিকের মূলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী এদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য ভূমি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু পাহাড়ি এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশ সাম্প্রতিককালের নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত। যা বাংলাদেশকে কৃষিতে সমৃদ্ধ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত?
(ক) পশ্চিমবঙ্গ (খ) ত্রিপুরা
(গ) মিয়ানমার (ঘ) বঙ্গোপসাগর

২। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) এক (খ) দুই
(গ) তিন (ঘ) চার

৩। বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৭১২ কি.মি. (খ) ৭১৬ কি.মি.
(গ) ৭২০ কি.মি. (ঘ) ৭২৫ কি.মি.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রহিম বন্ধুদের নিয়ে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে গেলেন। সেখানে দেখলেন অনেক উচু-নিচু পাহাড়। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা। পাহাড়ি অঞ্চলের সৌন্দর্য অবলোকন করলেন এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কেও ধারণা পেলেন।

৪। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা কত?
(ক) ৬১০ মিটার (খ) ৭১০ মিটার
(গ) ৮১০ মিটার (ঘ) ৯১০ মিটার

৫। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. জনসংখ্যার ঘনত্ব কম ii. জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ iii. আঁকা-বাঁকা রাস্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.২ বাংলাদেশের নদ-নদী (Rivers of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর নাম সম্পর্কে জানবেন এবং
- প্রধান নদীগুলোর উৎপত্তি ও গতিপথ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, করতোয়া, মহানন্দা, সাঙ্গু, নাফ, ফেনী।

বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীগুলো এদেশের প্রাণ। ছোট বড় প্রায় ৭০০ নদী এদেশকে জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে। ফলে এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর নদ-নদীর প্রভাব অধিক। দেশের প্রধান নদীগুলো হলো-পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী প্রভৃতি। এগুলোর অসংখ্য শাখানদী এবং উপনদী রয়েছে। তবে অনেক নদী মরে গেছে বা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে অথবা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আবার কোথাওবা নদী তার পুরাতন নামও হারিয়েছে। প্রধান নদী, শাখানদী এবং উপনদীসহ মোট নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো (চিত্র- ৯.২.১)।

পদ্মা (Padma) : বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা। এ নদী গঙ্গা নামে মধ্য হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা নামে সমভূমিতে প্রবেশ করেছে। এখান থেকে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নামক স্থানে ভাগিরথী (বা হুগলি নদী) নামে এর একটি শাখা বের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। আর গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দের নিকট যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিশেছে। অত:পর তিন নদীর মিলিত স্রোত মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩৪,১৮৮ বর্গকিলোমিটার।

পদ্মার শাখানদীগুলোর মধ্যে কুমার, ভৈরব, গড়াই, মাথাভাঙ্গা, ইছামতি, আড়িয়াল খাঁ উল্লেখযোগ্য। উত্তর দিক থেকে আগত উপনদীগুলোর মধ্যে মহানন্দা প্রধান। আর মহানন্দার উপনদীগুলোর মধ্যে রয়েছে পুনর্ভবা, নাগর, কুলিক, ট্যাংগন, পাগলা প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুত্র (Brahmaputra) : ব্রহ্মপদ নদ হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর এটি তিব্বত ও আসামের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদ ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় মিলিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভিতরে এ নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৭ কিলোমিটার। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী। আর প্রধান শাখানদী হলো বংশী ও শীতলক্ষ্যা।

মেঘনা (Meghna) : ভারতের আসাম রাজ্যের নাগা-মনিপুর পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন বরাক নদী সিলেট সীমান্তে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উত্তর দিক দিয়ে আগত শাখা সুরমা পশ্চিমে অবস্থিত ছাতক, সিলেট ও সুনামগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর আজমিরিগঞ্জের কাছে উত্তর সিলেটের সুরমা, দক্ষিণ সিলেটের কুশিয়ারা এবং হবিগঞ্জের কালনী নদী একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে সুরমা, কুশিয়ারা ও কালনী নদীর মিলিত প্রবাহ কালনী নামে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। মেঘনা নদী কিশোরগঞ্জের ভৈরববাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা

নামে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। মেঘনার উল্লেখযোগ্য উপনদী হলো মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী, কাসনি এবং শাখানদী জাঙ্গালিয়া ও ডাকাতিয়া। বাংলাদেশের মেঘনা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২৯,৭৮৫ বর্গকিলোমিটার।

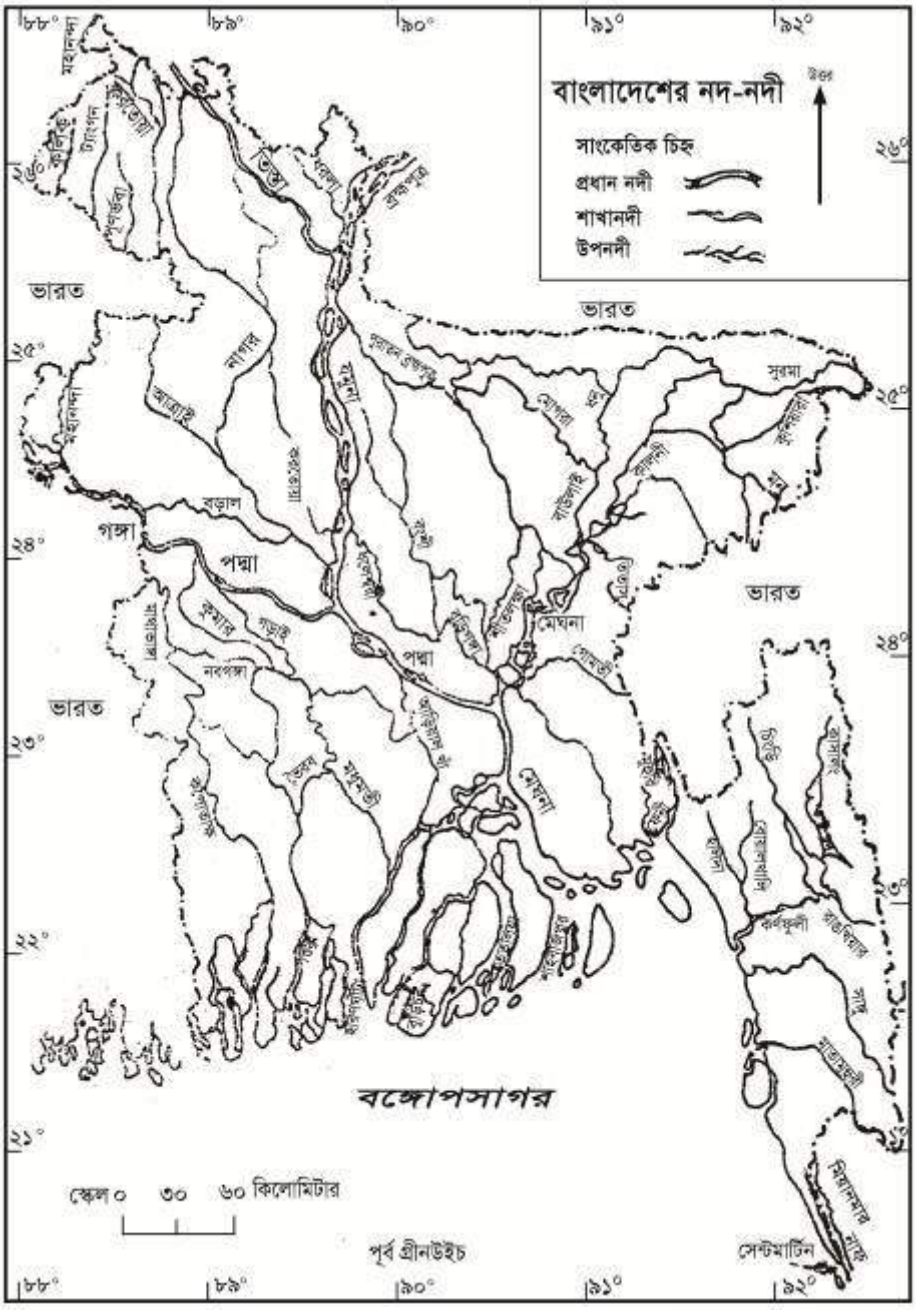

চিত্র ৯.২.১: বাংলাদেশের নদ-নদী

যমুনা (Jamuna) : ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা যমুনা নদী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এটি গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অন্যতম নদী। যমুনার প্রধান উপনদী হলো ধরলা, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই। এছাড়া যমুনার প্রধান শাখানদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা।

করতোয়া (Kartoa) : করতোয়া নদীর মূলধারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে। এটি পঞ্চগড় জেলার ভিটগড়ের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দিনাজপুর জেলার খানসামার

নিকট এটি আত্রাই নামে পরিচিত। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে সমাধিঘাট পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করেছে। এ নদী পুনরায় রাজশাহী জেলার দেওয়ানপুরে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বড়াল নদীর মধ্য দিয়ে পাবনার বেড়ার নিকট যমুনায় পতিত হয়েছে। এটি যমুনার দীর্ঘতম উপনদী।

মহানন্দা (Mahananda) : হিমালয়ের পাদদেশে দার্জিলিং এর নিকটবর্তী মহালড্রীম পর্বত হতে মহানন্দা নদী উৎপত্তি হয়েছে। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার উপজেলা সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করে। অত:পর ভারতের পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চাপাইনবাবগঞ্জের নিকট বাংলাদেশে পুনরায় প্রবেশ করে গোদাগাড়ির কাছে পদ্মার মিলিত হয়েছে। নাগর, ট্যাংগন ও পুণর্ভবা এর উপনদী।

কর্ণফুলী (Karnaphuli) : কর্ণফুলী নদী আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান নদী। এ নদীর দৈর্ঘ্য ২৭৪ কিলোমিটার। কর্ণফুলির প্রধান উপনদী কাসালং, হালদা ও বোয়ালখালি। রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরটি বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত।

সাঙ্গু (Shangu) : সাঙ্গু নদী বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত আরাকান পাহাড়ে উৎপন্ন হয়েছে। অত:পর বান্দরবান ও চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

ফেনী (Feni) : ফেনী নদী ভারতের ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি হয়েছে। ফেনী জেলার পূর্ব সীমানা দিয়ে প্রবেশ করে সন্দ্বীপ প্রণালির উত্তরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এ নদীটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক জেলা ফেনীর নামে পরিচিত এবং ফেনী জেলাতেই অবস্থিত।

নাফ (Knaf) : নাফ নদীর উৎপত্তিস্থল মিয়ানমার। এ নদী বাংলাদেশের টেকনাফ ও মিয়ানমারের সীমানা নির্দেশ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর নিম্নোক্ত তথ্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

অসংখ্য নদ-নদী জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পরিচিত করে তুলেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীসহ প্রায় ৭০০ ছোট বড় নদী বাংলাদেশকে উর্বর পলল ভূমিতে পরিণত করেছে। নদীগুলোর সাথে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নদীকেন্দ্রিক যাতায়াত ব্যবস্থা, শহর, নগর, বন্দর প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে বহুভাবে প্রভাবিত করে। তাই নদীগুলোর স্বাভাবিক গতিপথ নিশ্চিত করা আমাদের সকলের উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ভারতের আসাম রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন একটি নদী বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত দিয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবেশ করেছে। পরে আরও একটি নদী এ দুইটি শাখার সাথে মিলিত হয়ে কিছুদুর প্রবাহিত হয়ে নতুন নাম ধারণ করেছে।

১। আলোচ্য নদীটি ভারতে কী নামে পরিচিত?
   (ক) সুরমা (খ) কুশিয়ায় (গ) বরাক (ঘ) কালনী

২। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সীমান্ত দিয়ে প্রবেশকারী নদী দুইটির নাম কী?
   (ক) সুরমা ও কুশিয়ারা (খ) সুরমা ও তিতাস (গ) কুশিয়ারা ও তিতাস (ঘ) সুরমা ও কালনী

পাঠ-৯.৩ বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

(Climatic Characteristics of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবহাওয়া ও জলবায়ু বলতে কী বুঝায় তা জানবেন এবং
- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	ঋতু বৈচিত্র্যতা, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, কালবৈশাখী ঝড়।

বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, জলবায়ু বলতে কোনো একটি বৃহৎ অঞ্চলের ৩০-৪০ বছরের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার গড়কে বুঝায়। আর আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির দৈনন্দিন অবস্থা। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র এবং অনেকটা সমভাবাপন্ন। দেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এবং মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব বিদ্যমান থাকায় এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মৌসুমি বায়ু এবং মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো এক একটি ভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বছরে ৩টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতু দেখা যায়। এগুলো হলো-

ক. গ্রীষ্মকাল
খ. বর্ষাকাল এবং
গ. শীতকাল

আমাদের দেশের জলবায়ুতে ঋতুভিত্তিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কোনো সময়ই শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হয় না। অর্থাৎ শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল, উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১° সেলসিয়াস এবং শীতকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৯° এবং ১১° সেলসিয়াস। অর্থাৎ আমরা যদি উভয় ঋতুর তাপমাত্রাগত পার্থক্য দেখি তাহলে দেখা যাবে, গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের তাপমাত্রার পার্থক্য ৫°-১০° সেলসিয়াস। এদেশের গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা ২৭° থেকে ৩২.২° সেলসিয়াস এবং শীতকালীন গড় উষ্ণতা ১৩.২° থেকে ২১° সেলসিয়াস। বর্ষাকালে গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের এক পঞ্চমাংশ গ্রীষ্মকালে হয় আর শীতকালে খুব সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বৃষ্টিপাতের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয় রাজশাহী অঞ্চলের লালপুরে ১১৭.৫ সেন্টিমিটার বা ৪৭ ইঞ্চি এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত সিলেট অঞ্চলের লালখানে, ৬৩৭.৫ সেন্টিমিটার বা ২২৫ ইঞ্চি। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০৩ সেন্টিমিটার। দেশের পশ্চিমাংশের তুলনায় পূর্বাংশে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া এখানকার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৃষ্টির ফলে প্রায় প্রতিবছর বন্যা হয়। কখনো কখনো এই বন্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের জলবায়ুর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো কালবৈশাখী ঝড়। সাধারণত মার্চ এপ্রিল মাসে এ ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এ ঝড়ের ফলে জীবন, ঘর-বাড়ি ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

এছাড়া ঋতুভেদে আর্দ্রতার বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শীতকালে বাতাসের গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৩% থেকে ৮৪% হয়ে থাকে। অপরদিকে গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রায় ৮৩% থেকে ৮৯% পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে বায়ুপ্রবাহের বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে অধিকাংশ বায়ু অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। এ বেগ সাধারণত মার্চ থেকে আগস্ট মাসে বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালের বৃষ্টির সাথে প্রবাহিত হওয়া ঝড়ো হাওয়া বাতাসের গড় বেগকে প্রভাবিত করে।

সবশেষে বলা যায় যে, সমভাবাপন্ন বাংলাদেশের জলবায়ুতে তাপমাত্রা, প্রচুর বৃষ্টিপাত, অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং ঋতুগত উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সহনশীল জলবায়ু কৃষিকাজ, উদ্ভিজ্জ, শিল্প, ব্যবসা, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বহুলাংশে প্রভাবিত করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র এবং সমভাবাপন্ন। মৌসুমী বায়ু এখানকার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল, উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল এখানকার জলবায়ুর বিশেষ দিক। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে। বর্ষাকালে প্রায় পাঁচভাগের চারভাগ বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে খুব সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিপাত পাহাড়ি এলাকায় হতে দেখা যায়। তিন ঋতুর কোনো সময়ই তাপমাত্রা চরমভাবাপন্ন হয় না। এপ্রিল উষ্ণতম মাস। এছাড়া ঋতুভিত্তিক বায়ুর আর্দ্রতা এবং বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতিতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বাংলাদেশের জলবায়ু কী নামে পরিচিত?

(ক) শীতল জলবায়ু (খ) ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু

(গ) নিরক্ষীয় জলবায়ু (ঘ) ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু

২। বাংলাদেশের জলবায়ুকে কয়টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতুতে ভাগ করা যায়?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি

(গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

৩। নিচের তথ্যসমূহ লক্ষ্য করুন। বাংলাদেশে-

i. উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল

ii. শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল

iii. বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস?

(ক) ২৯° এবং ১১° (খ) ৩৪° এবং ২১°

(গ) ২৭° এবং ৩২° (ঘ) ৩২° এবং ১১°

পাঠ-৯.৪ বাংলাদেশের ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত (Seasonal Temperature, Wind Movement and Rainfall of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জলবায়ুকে ঋতুভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ঋতুভিত্তিক বায়ুপ্রবাহের ধরণ জানবেন এবং
- ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	জলবায়ু, ঋতু, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শীতকাল, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত।

বাংলাদেশের ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রকৃতি এখানকার জলবায়ুর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মৌসুমী বায়ুর অত্যধিক প্রভাবের দরুণ এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত। বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন, তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এদেশের জলবায়ুকে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো:

ক. গ্রীষ্মকাল (Summer Season) খ. বর্ষাকাল (Rainy Season) এবং গ. শীতকাল (Winter Season)

নিম্নে বাংলাদেশের ঋতু তিনটির বিবরণ দেওয়া হলো (চিত্র- ৯.৪.১, ৯.৪.২ এবং ৯.৪.৩)।

ক. **গ্রীষ্মকাল** : বাংলাদেশে মার্চ হতে মে মাস (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এ ঋতুতে সূর্যের উত্তরায়নের ফলে উত্তাপের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল হতে উত্তরের দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। নিম্নে এ ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বর্ণনা করা হলো।

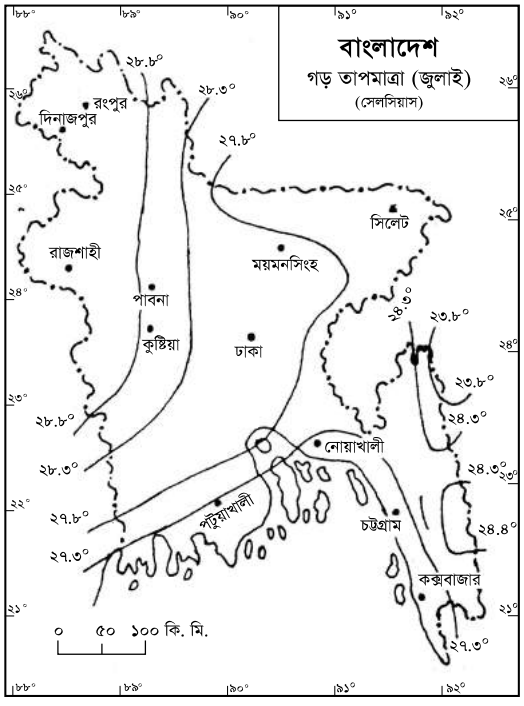

চিত্র-৯.৪.১: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

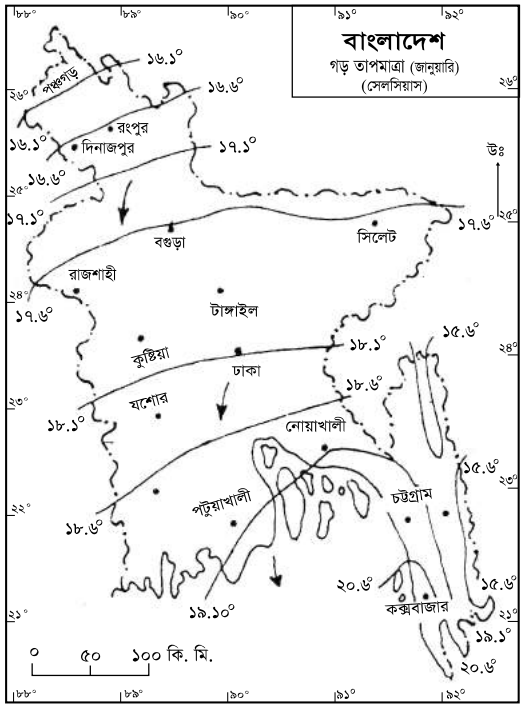

চিত্র-৯.৪.২: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

তাপমাত্রা : আমাদের দেশে গ্রীষ্মকাল সবচেয়ে উষ্ণ ঋতু হিসেবে পরিচিত। এ ঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১° সেলসিয়াস। এপ্রিল উষ্ণতম মাস। এ মাসের গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৮° সেলসিয়াস। এ সময় সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরে অর্থাৎ উত্তর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- এপ্রিল মাসে যখন কক্সবাজারে ২৭.৬৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রা তখন রাজশাহীর তাপমাত্রা প্রায় ৩০° সেলসিয়াস ।

বায়ুপ্রবাহ : গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধের নিকটবর্তী হওয়ায় বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বাংলাদেশের ওপর দিয়ে শুষ্ক ও আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে একই সময় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। উভয় বায়ুর সংঘর্ষে এ সময় বাংলাদেশে প্রায়ই বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয় যা কালবৈশাখী **(Nor' wester)** নামে পরিচিত। মার্চ-এপ্রিল মাসে এই ঝড় বজ্রবিদুৎসহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়।

বৃষ্টিপাত: কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বৃষ্টিপাত এই সময়ে হয় এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫১ সেন্টিমিটার। অনেক সময় কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

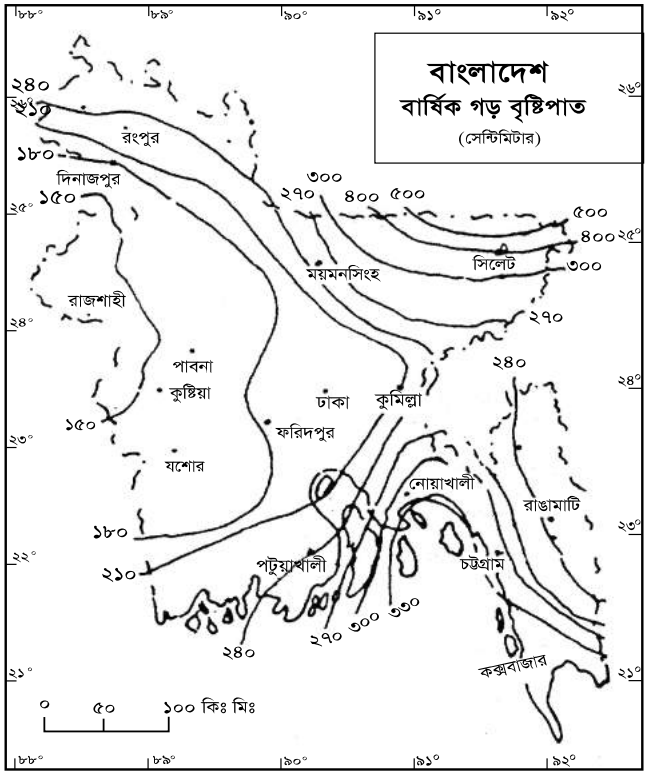

চিত্র-৯.৪.৩: বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

খ. বর্ষাকাল : জুন হতে অক্টোবর মাস (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) পর্যন্ত এদেশে বর্ষাকাল বিরাজমান থাকে। এটি গ্রীষ্ম ও শীতকালের মাঝামাঝি সময়। এ সময় সারা দেশেই কম বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। জুন মাসের প্রথমার্ধে মৌসুমী বায়ুর আগমনের সাথে সাথে বর্ষা ঋতু শুরু হয়ে যায়। নিম্নে বর্ষা ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের বর্ণনা দেওয়া হলো।

তাপমাত্রা : বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে অতিরিক্ত তাপ অনুভূত হওয়ার কথা থাকলেও অধিক বৃষ্টিপাতের দরুণ তাপমাত্রা খুব বেশি অনুভূত হয় না। এ সময় গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস। এ ঋতুতে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে।

বায়ুপ্রবাহ : জুন মাসে সূর্য এদেশের ওপর অবস্থান করায় বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু অন্তর্হিত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্রানুসারে উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে পরিণত হয়। বর্ষা ঋতুর শেষে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে দেখা যায়।

বৃষ্টিপাত : বর্ষাকালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প ধারণ করে নিয়ে আসে। এ জলীয়বাষ্প ঘণীভূত হয়ে শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০ ভাগ এ ঋতুতে হয়ে থাকে।

গ. শীতকাল : বাংলাদেশের প্রতি বছর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময় শীতকাল। এ সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে থাকায় সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পতিত হওয়ায় উত্তাপের পরিমাণ কম থাকে। ফলে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের পর তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে। নিম্নে এ ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের বর্ণনা দেওয়া হলো।

তাপমাত্রা : শীতকাল আমাদের দেশে ঠান্ডার সময় হিসেবে পরিচিত। এ সময় তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১১° সেলসিয়াস। জানুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস এবং এটি শীতলতম মাস। এ সময় দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষা উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা অনেক কম থাকে। ১৯০৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরে সর্বনিম্ন ১° সেলিসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় যা এদেশের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা।

বায়ুপ্রবাহ : শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে, যার সর্বনিম্ন পরিমাণ প্রায় ৩৬ শতাংশ। কখনো কখনো দেশের উত্তরাঞ্চলের ওপর দিয়ে তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় তীব্র শীত অনুভূত হয়।

বৃষ্টিপাত : শীতকালে এদেশে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এ সময় উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। শীতকালে সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয় যার পরিমাণ ১০ সেন্টিমিটারের বেশি নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের **ঋতুর** নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ণয় করুন।

ঋতুর নাম	তাপমাত্রা	বায়ুপ্রবাহ	বৃষ্টিপাত
গ্রীষ্মকাল			
বর্ষাকাল			
শীতকাল			

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু' নামে পরিচিত। বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন, তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এদেশের জলবায়ুকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো- গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল এবং শীতকাল। তিনটি ঋতুই বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বৈচিত্র্যতা লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম ঋতু কোনটি?
(ক) গ্রীষ্মকাল (খ) বর্ষাকাল
(গ) শীতকাল (ঘ) সবগুলো

২। কোন মাসে মৌসুমী বায়ুর আগমন ঘটে?
(ক) জানুয়ারি (খ) মার্চ
(গ) মে (ঘ) জুন

৩। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন-
i. জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে
ii. শীতকালে উত্তরাঞ্চলে মাঝে মাঝে তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়
iii. শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশে শীতকালে সর্বনিম্ন ১° সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় কত সালে?
(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯১৫
(গ) ১৯৫২ (ঘ) ১৯৩৫

পাঠ-৯.৫ মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং কালবৈশাখী ঝড়
(Characteristics of Monsoon Climate and Nor' wester)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবেন এবং
- কালবৈশাখী ঝড় কখন ও কীভাবে হয় তা বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	মওসুম, কালবৈশাখী ঝড়।

মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং কালবৈশাখী ঝড়

আরবি ভাষায় 'মওসুম' শব্দের বাংলা অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তিত হয় তাই হলো মৌসুমী বায়ু। গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে স্থলভাগ এবং জলভাগের উষ্ণতার তারতম্যের জন্য মৌসুমী বায়ু সৃষ্টি হয়। সাধারণত ১৫° থেকে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত মহাদেশসমূহের পূর্ব প্রান্তে এ জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Monsoon Climate) : মৌসুমী জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যে হলো ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে দিক পরিবর্তন। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে এটি জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে এবং শীতকালে স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকে। বায়ুর চাপ, তাপ, প্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত দ্বারা এ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিরূপন করা হয়। সাধারণত মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে তিনটি ঋতু সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো-শীতল ও শুষ্ক শীতকাল, উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং আর্দ্র বর্ষাকাল। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলভুক্ত অঞ্চলের সব ঋতুতেই কম বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তবে বর্ষাকালেই সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে(চিত্র - ৯.৫.১)।

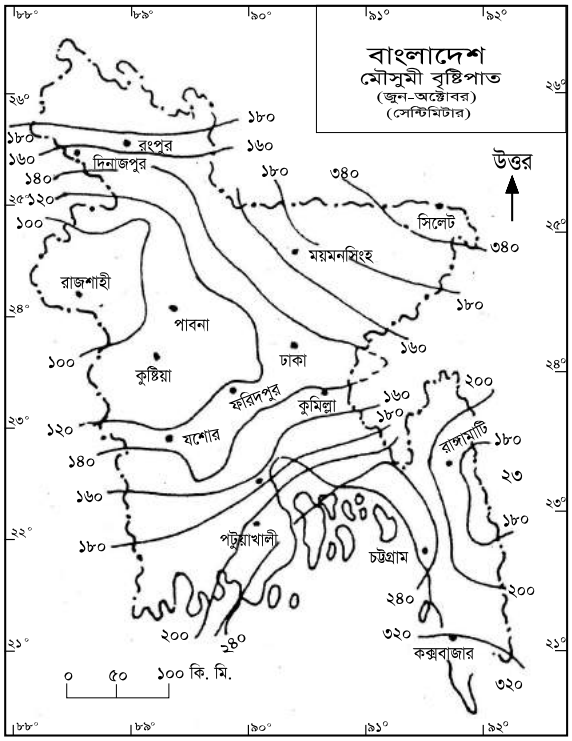

চিত্র-৯.৫.১: বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত

বাংলাদেশে জুন মাসের শুরুতে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হলে বৃষ্টিপাত হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এদেশের সর্বত্র মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল বলে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এ সময় হয়ে থাকে। এ ঋতুতে সূর্য বাংলাদেশের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় তাপমাত্রা অধিক থাকার কথা, কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং বৃষ্টিপাতের জন্য তাপমাত্রা কমে যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে প্রায়ই নিম্নচাপ (Depression) বা ঘূর্ণিঝড়ের (Cyclone) সংযোগ থাকে। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এপ্রিল উষ্ণতম মাস। গড় হিসেবে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮°

সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রার বিশেষ কোনো পার্থক্য হতে দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা সাগর থেকে দেশের অভ্যন্তরে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কালবৈখাশী ঝড় (Nor' wester): বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো কালবৈখাশী ঝড়। এটি গ্রীষ্মকালীন জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণত বৈশাখ মাসের শেষের দিকে এ ঝড় হতে দেখা যায় বলে একে কালবৈশাখী বলা হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার দিকে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে আসে এবং সেই সাথে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয়। এটিই কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। কালবৈশাখী ঝড়ে বাৎসরিক এক পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাত হয় (চিত্র - ৯.৫.২)। এ ঝড়ের ফলে উষ্ণতা স্বাভাবিকের তুলনায় ৫°-১০° সেলসিয়াস কমে যায়। কালবৈশাখী ঝড় সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো নিম্নচাপ (Depression)। নিম্নচাপের কারণে উষ্ণ বাতাস ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এর ফলে সৃষ্ট ফাঁকা জায়গা পূরণের জন্য ঠান্ডা বাতাস প্রচন্ড বেগে ঐ ফাঁকা স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে ঝড়ের উৎপত্তি হয়। এ ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় প্রায় ৪০ কি. মি. থেকে ৮০ কি.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো সময় এর গতিবেগ ঘন্টায় ১২৮ কি. মি. এরও বেশি হতে পারে। এ ঝড় দেশের পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয় এবং এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশি। অনেক সময় বৃষ্টির সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কাঁচা ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়। মানুষ, পশুপাখি এবং সম্পদহানি ঘটে। এছাড়া ফসলেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

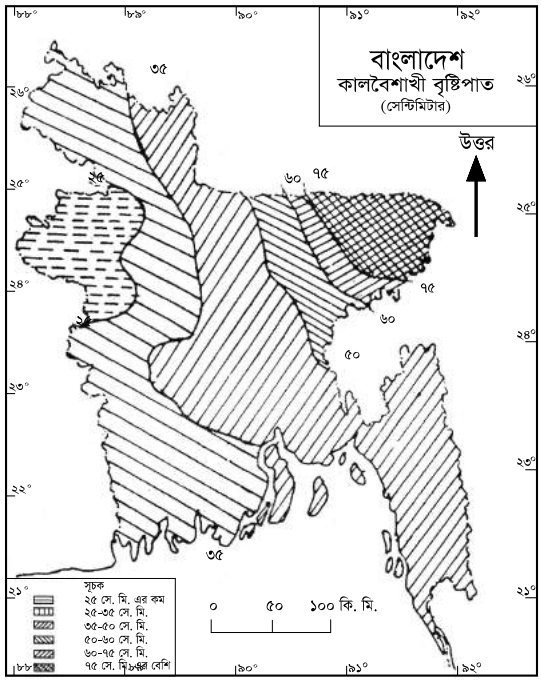

চিত্র-৯.৫.২: বাংলাদেশের কালবৈশাখী বৃষ্টিপাত

শিক্ষার্থীর কাজ	গ্রীষ্মকালের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	বায়ুর গতি	ঝড়ের কারণ

সারসংক্ষেপ :

মৌসুমী জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ুর দিক পরিবর্তিত হওয়া। গ্রীষ্মকালে এটি জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে এবং শীতকালে স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দেশের সর্বত্র মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। এ সময় সূর্য বাংলাদেশের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা উপকূলীয় অঞ্চল থেকে দেশের উত্তরের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। মার্চ-এপ্রিল মাসে দেশে প্রায়ই কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। এর ফলে জীবন ও সম্পদ হানি ঘটে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। 'মওসুম' শব্দের বাংলা অর্থ কী?

(ক) মাস (খ) ঋতু (গ) বছর (ঘ) বায়ু

২। নিচের তথ্যগুলো খেয়াল করুন-

i. ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মৌসুমী বায়ুর দিক পরিবর্তিত হয়

ii. গ্রীষ্মকালে জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়

iii. শীতকাল বৃষ্টিবহুল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। আকাশে মেঘের গর্জন আর বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আশে-পাশের অনেক বাড়িঘর, সম্পদ ও প্রাণহানি হলো।

৩। উপরে উল্লিখিত ঝড়টি কি নামে পরিচিত?

(ক) কালবৈশাখী (খ) টর্নেডো (গ) ঘূর্ণিঝড় (ঘ) সবগুলো

৪। উল্লিখিত ঝড়টি সৃষ্টির প্রধান কারণ কী?

(ক) উচ্চচাপ (খ) নিম্নচাপ (গ) উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ (ঘ) উষ্ণতা

৫। আলোচ্য ঝড়টি কোন অঞ্চলে বেশি হয়?

(ক) পশ্চিমাঞ্চল (খ) উত্তরাঞ্চল (গ) দক্ষিণাঞ্চল (ঘ) পূর্বাঞ্চল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

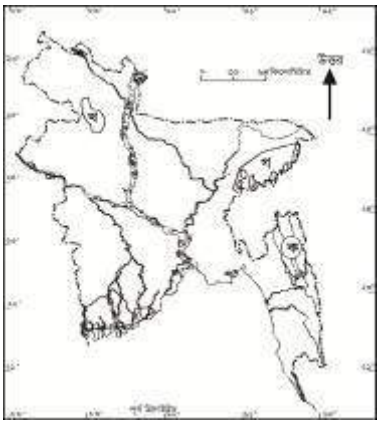

ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত মানচিত্রটি কোন দেশের?

খ. বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

গ. মানচিত্রে 'ক' চিহ্নিত স্থানের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

ঘ. 'খ' এবং 'গ' চিহ্নিত স্থানের ভূ-প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

১নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত মানচিত্রটি বাংলাদেশের।

খ. বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
২. প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ
৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

গ. 'ক' চিহ্নিত অঞ্চলটি মূলত টারশিয়ারি যুগের পাহাড়। এটি দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং চট্টগ্রাম জেলা নির্দেশ করছে। আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বে এই পাহাড়গুলো উৎপত্তি লাভ করেছে। পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিং ডং (বিজয়) এ অঞ্চলে অবস্থিত যার উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এখানকার মাটির রঙ ধূসর ও লালচে। ভূ-প্রকৃতিগত কারণে এখানে জনবসতি খুব কম এবং পাহাড়ের ঢালে জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' চিহ্নিত অঞ্চলটি প্লাইস্টোসিন কালের চত্বরভূমি যা বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। এটি রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট এবং রংপুর বিভাগের রংপুর, দিনাজপুর ও গাইবান্ধা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এর আয়তন প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। এখানকার মাটি সমতল প্রকৃতির। প্লাবন সমভূমি থেকে এ উঁচু ভূমির গড় উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার।

'গ' চিহ্নিত অঞ্চলটি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এটি ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এ অঞ্চলটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত এবং ভূমি ঢালু প্রকৃতির। এ অঞ্চলে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় অবস্থিত। এখানকার পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয় এবং মৃত্তিকার রং লালচে ও ধূসর। পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এখানে পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়।

সুতরাং আমরা 'খ' এবং 'গ' চিহ্নিত অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। ভূ-প্রকৃতি দুইটির গঠন প্রক্রিয়াও ভিন্ন।

- **উপরের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের আলোকে নিম্নের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার চর্চা করুন।**

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

একদল শিক্ষার্থী শিক্ষা সফরের জন্য বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গেলেন। সেখানে তারা উঁচুভূমি দেখতে পেলেন। এছাড়া সেখানে ভারত থেকে আসা একটি নদী বাংলাদেশের সীমান্তে এসে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পরবর্তীতে এ দুইটি নদী আবার একত্রে মিলিত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ক. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে কী নামে পরিচিত?
খ. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোকে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় বলার কারণ কী?
গ. আলোচ্য নদীটি ভারতের কোথায় থেকে এবং কীভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?
ঘ. বর্ণিত নদী দুইটির বাংলাদেশের গতিপথ বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম দেশ। এদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। তবে দেশের সর্বত্র সব সময় সমান বৃষ্টিপাত হয় না। বৃষ্টিপাতের ওপর এদেশের কৃষি আবাদের উৎপাদন নির্ভর করে।

ক. বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে?
খ. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়?
গ. বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ুর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. 'বাংলাদেশকে মৌসুমী জলবায়ুর দেশ' বলার যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১. গ ২. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১. ক ২. ঘ ৩. ঘ ৪.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ : ১. খ ২. খ. ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ